মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ
ইসলামী বাংলা সাহিত্যের অজানা পাঠ

বর্ণালী ঘোষ দস্তিদার
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া
ইমেল : barnalichobigan@gmail.com

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মর্মে প্রবেশ করলে দেখবো হিন্দু কবিরা যখন দেবদেবী-মাহাত্ম্য কীর্তনের মাধ্যমে দৈবপূজা প্রচারে ব্যস্ত, তখন মুসলমান কবিরা বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক প্রণয় কাহিনী লিখে স্বাধীন সৃজন আনন্দের সঙ্গসুখ আস্বাদন করছেন ।

সম্ভবত অপৌত্তলিকতা এবং একেশ্বর আল্লাহর কারণেই সমাজের ভ্রূকুটি সইতে হোত না তাঁদের। যা ভীষণভাবে সহ্য করতে হোত হিন্দু কবিদের। সইতে হোত রক্ষণশীল গোঁড়া সমাজের কঠোর অনুশাসন। যে কারণে অমন যে ললিতলোভন লাবণ্যেভরা রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা তাকেও তাত্ত্বিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নির্দেশে অমরার বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর শাশ্বত প্রেমের ভেক ধারণ করতে হোল। লৌকিক রোম্যান্টিক প্রণয়কাহিনীকে পরানো হোল আধ্যাত্মিকতার বর্ম। অথচ এই বাংলা সাহিত্যেই যে অসংখ্য মুসলমান কবিদের সৃষ্টি সমান্তরাল ফল্গুধারার মতো অবিশ্রান্ত বহমান ছিল তা আমাদের উত্তমর্ণরা শ্রদ্ধার সঙ্গে কখনও জানানোর প্রয়োজন মনে করেন নি। বা গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে এই মুসলমান কবি-লেখকদের কিছু কিছু নির্বাচিত রচনা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করে সাহিত্যপাঠের স্বাদবদল করানোর কথাও মনে হয়নি কারুর....যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এবং এরকম নানাবিধ আপাত নিরীহ কারণেই একই দেশের ভূখণ্ডে দীর্ঘদিন বসবাস করেও আমরা হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের জীবন-যাপন-সংস্কৃতি সম্পর্কে তেমন সম্যক ধারণা পোষণ করতে পারিনি।

ভারতে মুসলমান শক্তির প্রথম পদার্পণ ঘটেছিল সিন্ধু-পাঞ্জাব অঞ্চলে। বহুকাল থেকে সম্ভবত খ্রিষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ দশক থেকেই ইরানের সঙ্গে এই অঞ্চলের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ত্রিহুত-আসাম-উড়িষ্যা ছাড়া আর্যাবর্তের প্রায় সবটুকুই তুর্কি-পাঠান অধিকারে এসেছিল। এসময় সাহিত্যের দুটি প্রধান বাহন ছিল সংস্কৃত ও অবহট্ট (অপভ্রংশ)। সংস্কৃতধর্মী সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমান কবিদের পরিচয় ছিল না এমন নয় কিন্তু সাধারণ স্বল্পশিক্ষিত ও লোকায়ত জনসাধারণের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা তুলনায় নিবিড়তর থাকায় অপভ্রংশকেই তারা সাহিত্যের অবলম্বন করেছিলেন। তার প্রমাণ পেলাম কবীরের গানে। সে গানে চর্যাগীতির কবি ঢেন্ঢণপা-র অনুরণন....

‘নিতি নিতি শৃগালা সিংহ সনে জুঝে
কহে কবীর বিরল জনে বুঝে’

লৌকিক ভাষায় সাধনগীতির সাক্ষর রেখেছিলেন পাঞ্জাবের সুফীসাধক শেখ ফরীরুদ্দিন (১২৬৭)। অধ্যাপক সুকুমার সেন জানাচ্ছেন মুসলমান এক কবির অপভ্রংশে লেখা একটি কাব্যও (‘পান্থদূত’) নাকি আবিষ্কৃত হয়েছে কয়েক বছর আগে। অপভ্রংশে ‘সংনেহয়-রাসয়’ বা ‘সন্দেশক-রাসক’ এর নাম। এ কাব্যের কবি অদ্দহমান বা অবদুর রহমান ছিলেন মূলতানের অধিবাসী। অপভ্রংশ বা অবহট্টের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার নিপুণ ছবিই ধরা দিয়েছে এই কাব্যে।

১৪৩৯ বঙ্গাব্দে অওয়ধি প্রাকৃতে রচিত হয়েছিল দাউদের ‘চান্দায়ন কাব্য’। লিখেছিলেন মিয়াঁ সাধন। কুতুবনের ‘মৃগাবতী’ও খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সুফী সাধক কুতুবন জৌনপুর থেকে পালিয়ে বাংলায় হোসেন শাহ-র দরবারে ঠাঁই নিয়েছিলেন।

JOCAS
Journal of Commerce, Arts and Science
Volume: 4, Issue : 1, December 2021

'কুতুবন নাম লেই পা ধরে
সরবর দী দুহ জগ নীর ভরে'।

এ হোল সম্পূর্ণ রূপকথাসুলভ রোম্যান্টিক কাব্য। যদিও এগুলির আবেদন সুনির্দিষ্ট দেশ-কাল পরিধির ঊর্ধ্বে।

পাঠান রাজত্বের অবসানে কামতা-ত্রিপুরা-শ্রীহট্ট-দরঙ্গ-কাছাড়-চাটিঙ্গা-রোসাঙ-মল্লভূম-ধলভূম প্রভৃতি স্থানে হোসেন শাহের লস্কর পরাগল খাঁ বা নুসরত খাঁ গৌড় দরবারে নিজেদের মতো করে এক সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই সুবাদেই রাজা সুধর্মার রাজ্যকালে রোসাঙ্ রাজদরবারে দুই বিশিষ্ট কবি আমাদের পরিচিত দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল। রোসাঙের রাজা সুধর্মার লস্কর আশরফ খানের অনুরোধে সুফী কবি সাধক দৌলত কাজী 'লোর চন্দ্রাণী' পাঁচালী কাব্য রচনা করেন। এর শুরুতে আল্লা-রসুলের বন্দনা থাকলেও আদতে এটি একটি রোম্যান্টিক প্রণয়কাব্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন যে দৌলত কাজী তাঁর এই প্রেমের কাব্যাখ্যানটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। তাঁর শেষ লেখা কাব্যপংক্তি.....

'বহয়ে পবন মন্দ বাজায়ে মদন দ্বন্দ্ব
হৃদে জাগে বিরল অনলহ
পতি-রতিক্রিয়া গেল সেকান্তআরনাদেখিল
শরীর দগধে শ্রমজল।'

মধ্যযুগে পুরাণ-পাঁচালি শুধু হিন্দুরই নয়, ইসলামেও ছিল। চট্টগ্রাম ও সিলেটে মুসলমান বসতির ইতিহাস সুপ্রাচীন কালের। বিখ্যাত 'জঙ্গনামা' বা যুদ্ধকথা প্রচলিত ছিল সিলেটে। লেখা হয়েছিল 'কায়থী' অক্ষরে যা 'সিলেটি নাগরী' নামে প্রসিদ্ধ।

'নবীবংশ', 'রসুলবিজয়', 'মোহম্মদবিজয়' এইগুলিই হলো সেই পুরাণ-পাঁচালী। কবিরা ছিলেন মনসুর, মুর্শেদ, হামিদ প্রমুখ। রোম্যান্টিক প্রণয়কাহিনী 'চন্দ্রমুখী' ছাপা হয়েছিল 'কায়থী' (সিলেট নাগরী) হরফে। কবির নাম খলিল। খুব জনপ্রিয়তা পায় রূপকথা মিশ্রিত প্রণয়গাথা 'ভেলুয়া সুন্দরীর কাহিনি'। সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছিলেন কুমিল্লার মোয়াজ্জেম আলী।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদ্যাসুন্দর লিখেছিলেন মুসলমান কবি সারিবিদ খান। অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাউল-মুর্শেদি-ফকিরি গানেও পাওয়া গিয়েছে অপভ্রংশের চিহ্ন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফকির মহম্মদ লেখেন 'মানিকপীরের গীত'। মক্কার রহিমকে অযোধ্যার রাম বানিয়ে হিন্দু কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য লিখেছিলেন 'সত্যনারায়ণ' বা 'সত্যপীর পাঁচালী'। আবার দক্ষিণ রাঢ়ের কবি ফৈজুল্লা লিখেছিলেন 'সত্যপীরের পুস্তক'। অষ্টাদশ শতকের কবি ফৈজুল্লা লিখছেন.....

'শুনহ ভকত লোক হএ একচিত
সত্যপীর সাহেব সবার করে হিত
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি নারায়ণ
শুন গাজি তুমি আসরে দেহ মন।'

উনিশ শতকে কলকাতায় ছাপাখানার প্রাচুর্য দেখা দিল যার মালিক বা প্রকাশকরা অনেকক্ষেত্রেই হতেন মুসলমান। অশিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত বিশেষ করে শহর প্রবাসী মাঝি-মাল্লা, দোকানী-পসারী, চাকুরে-দালাল এদের কাছে আরবি-ফার্সি হিন্দি মিশ্রিত বাংলা বইএর খুব কদর ছিল। ইসলামী বাংলা বইগুলোর কাটতিও ছিল খুব। শিবপুরের মহম্মদ দানেশ লিখেছিলেন 'চাহার দরবেশ', 'নুল-ইমান', 'হাতেম তাই'। লায়লা-মজনুর প্রগাঢ় প্রেমকাহিনী উনিশ শতকের মধ্যভাগে হিন্দু মুসলমান প্রায় সমস্ত বাঙালি পাঠকের মন জয় করেছিল। এই মুখরোচক প্রেমের গল্প বাঙালির ঘরে ঘরে তুমুল জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল।

কবিরা লিখলেন মজনুর বেদনা.....

'পিন্দিবার জামা-জোড়া ফাড়িয়া ডালিল
লায়লি প্রেমে ভস্ম মেখে উদাসী হইল
প্রাণপ্রেয়সীর আশে লেঙ্গটা পিন্দিয়া
ধরিল ফকির বেশ প্রেম টুকনি লিয়া'

ওদিকে বিরহোন্মাদ লায়লি কাঁদে....

'মজনুর বিচ্ছেদ বাণে হৃদয়েতে তীর হানে
দেহ গেল ঝাঞ্ঝারা হইয়া
তুই কি কহিবি মোরে জিন্দেগীর আশা ছেড়ে
আছি আমি মজনুর লাগিয়া'

উনিশ শতকে পুরোনো রোমান্টিক গল্প-কাহিনির আদর খুব বেড়েছিল। আরব্য উপন্যাসের পদ্য অনুবাদ হয়েছিল উর্দু থেকে বাংলায় 'আলেফ-লায়লা'। এতে পাওয়া গেছে বর্ধমান জেলার ভৈটা গ্রাম নিবাসী নাসের আলী নামে এক অনুবাদকের নাম।

'হীন নাছের আলি বলে ভজ মন খোদা
আজহার আলি বাপ মোর গেয়াছদ্দি দাদা'।

এই রোমান্টিক কবিদের অনেকেই ছিলেন সুফী মতাবলম্বী। লিখেছেন.....

'প্রকাশিয়া অঙ্গ কালো অন্তর তোমার আলো
কালো মেঘের ভিতরেতে থাকে যেমন সৌদামিনী
কালো রূপ কৃষ্ণসার রাধা প্রেমে মজে তার
পাপী পায় পাপে মুক্ত সে নামারে মনে গণি'.....

এঁদের অনেকেই মুসলমান তরুণ ভূস্বামীদের সাহিত্যচর্চায় উৎসাহিত করেছিলেন। কবিরা ছিলেন ফতেউল্লা, আবদুল আলি, আমীর আলি প্রমুখ। আবদুল মজিদ সাতপুরুষ আগে ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ। তিনি শহিদ পীরকে বন্দনা করে লিখলেন.....

'বাদশাই আমল কালে এই জমিদারি মেলে
তিন শও বছর হইতে
পূর্বেতে বামুন ছিনু হালে মোছলমান হইনু
মোহাম্মিদ দীনের কারণে'

কবি মজিদ লিখছেন ঔপনিবেশিক কালে কুইন ভিক্টোরিয়ার জবরদস্ত রাজকরের কথা।

'লেয়সন করোসন দুই লাট বন্দি
খাজনা দাখিল করি দুই হাত বন্দি।
জরিপেতে বন্দোবস্ত হইয়াছে যার
বহুত মস্কেলে দিতে হবে রাজকর।
রাতদিন দোয়া করি মহারানির তরে

রাজ্যবৃদ্ধি হয় তার খোদাতালা করে
তাহাতে আইল এক এমন রাক্ষস
তাহার বিখ্যাত নাম ইনকাম টেকস
যদি আমি রসদ হাজির নাহি করি
গ্রাস করিয়া লিবে মোর জমিদারি'

আমরা যারা মুকুন্দরামের রচনায় ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারের বর্ণনা মূলধারার সাহিত্যের ইতিহাসে নিয়মিত পড়তে অভ্যস্ত তাদের কাছে এ-ও এক বিশেষ সময়ের রূঢ় সমাজবাস্তব। অভিজাত জমিদার বর্গের হাতে দরিদ্র প্রজানিপীড়নের জীবন্ত ছবি শুধু হিন্দু কবিরাই লিখেছিলেন এমন নয়, অনামী বহু মুসলমান কবিও নিজেদের অভিজ্ঞতা সহজ-সরল ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মুসলমান কবি - আখ্যানকারদের যেমন অত্যাচারী ভূস্বামীদের নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের আধিপত্যবাদও তাদের সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে আড়াল করে রেখেছিল। স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ করতে দেয়নি। মাথা তুলতে দেয়নি। ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তরের কথা শুনতে পায়নি বাঙালি সমাজ। সাত শতাব্দী ব্যাপী মুসলমান কবি-গায়করা বাংলার বুকে কখনও রোম্যান্টিক প্রণয় কবিতা লিখলেন কখনও হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দিলেন জনসমাজে। কিন্তু এই বৃহৎ মুসলমান কবিসমাজ না পেল খ্যাতি - পরিচিতি না কাব্যকৃতিত্ব। শুধু মুসলমান হওয়ার অপরাধেই কি চিরপ্রান্তিক হয়ে রইলেন এই লোককবির দল?

উনিশ শতকে এক মুসলিম লেখিকার নাম পাই। ফৈজুন্নিসা চৌধুরানী। তিনি গদ্যে ও পদ্যে এক বৃহৎ কাব্য লিখেছিলেন যার নাম 'রূপ জালাল'। বইটি ১৮৭৬ এ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কিংবদন্তীর ওপর নিজের স্বাধীন কল্পনা চালিয়ে লৌকিক প্রেমের ছবি এঁকেছিলেন মুসলমান গ্রামীণ কবি আবদুল আলী।

'ঘাড়ওয়ালের এক মেয়ে ছিল বয়স পনর ষোল
আরশি চেয়ে চুল ঝাড়ে চিরুণী লাগাই
আবদুল আলী যেই স্থানে নজর করে নিবারণে
দুইজনের দৃষ্টিপ্রেম চক্ষের আশনাই।'

ইসলামী শাস্ত্রের অনুসারে অনুবাদ, ইসলামী যোগধ্যান, তন্ত্র, নিত্যকৃত্য ইত্যাদি নিবন্ধ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে প্রচারিত হতে থাকে বিশেষত চট্টগ্রাম অঞ্চলে। বাংলাদেশের পুরোনো নাটগীতরীতির বিশুদ্ধ লৌকিক রূপটি মুসলমান জনগণের মধ্যে অবিকৃত ছিল এই সেদিন অবধি। পরে পুরাতন নাটুয়া 'নেটো'/ 'লেটো' হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে এলো। অনেকেই জানেন যে কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'লেটো'-র দলের গায়ক ছিলেন।পূর্ববঙ্গের চাষী-মাঝি-মাল্লাদের মধ্যে চলিত ছিল ভাটিয়ালির সুরমাধুর্য্যে পূর্ণ 'মধুমালা' গান।

'আমি স্বপ্নে দেখিনু মধুমালার মুখ
মদনকুমার যাত্রা করে
রানী কেঁদে ভূমে পড়ে
গো লোকজন'

জারি গানের বিষয় কারবালার করুণ কাহিনী।

'কারবালাতে যখন হোছেন খলখয়ে শহীদ হোল
হোছেনের শির নিয়ে কাফের দামেস্কাবাদে এল
ছের নিঞে তা কাফের গেল নেজায় চড়িয়া
কারবালাতে হোছেনের ধড় থাকিল পড়িঞা'

যাত্রাপালার একটি পুরোনো রূপ ছিল 'মোনাইযাত্রা'। এতে গোপীচন্দ্র ময়নামতীর কাহিনী রূপ পায়। যে বাদশা মোনাই

JOCAS
Journal of Commerce, Arts and Science
Volume: 4, Issue : 1, December 2021

নিজের রাজ্যে ফকির-দরবেশের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন তিনিই একসময় বাদশাহী ছেড়ে অধ্যাত্মবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। ফকির তাঁর মালিক হোল। কাব্যে রয়েছে গুরুশিষ্যসংবাদ। আল্লার প্রিয় ফেরেস্তা ছিল হারুত ও মারুত। তাদের নানা কীর্তিকাহিনী নিয়ে লেখা 'শাহ মাদারের কাহিনী' সংগ্রহ করে সম্পাদনা করেছিলেন ছায়াদ আলি খোন্দকার (১৯১০)। এ সময় সুফীধর্ম ও যোগসাধনার অপূর্ব মেলবন্ধন হয়।

'এ মোকামে যাওয়া বাবা বড়োই কঠিন
ডাইনে বামে খেয়াল করে দেখিবে মমিন'

চর্যাগানে আছে 'সাঙ্কমত চঢ়িলে দাহিন-বাম না চাহই'.....তারই যেন প্রচ্ছায়া।

অধ্যাপক শ্রী সুকুমার সেন জানাচ্ছেন, 'ইসলামী বাংলা বলতে এখন যা বোঝায় তার সৃষ্টি হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। তার আগে মুসলমান লেখকরা সাহিত্যে ব্যবহার করতেন সাধুভাষা। তার মধ্যে কিছু আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার থাকতো'। কেজো বাংলা গদ্যে আরবি-ফারসির চলন ছিল পাঠান-মোগল যুগে। ১৮৩৯ সাল থেকে বাংলাদেশের শাসনকার্য প্রণালীতে আরবি-ফারসি চলে গিয়ে এলো বাংলা। আরবি-ফারসি শুধু বন্ধই হোল না এসব শব্দ বাছাইও শুরু হোল। বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রবর্তন হোল সংস্কৃতশিক্ষিত ও ইংরেজি শিক্ষিতদের হাত ধরে। পাশাপাশি আরবি-ফার্সি জানা মুসলমানরা পুরোনো পথেই চলতে লাগলেন। ইংরেজ ও ইংরেজিকে যে তাঁরা বর্জন করলেন তাতেই হয়তো ঔপনিবেশিক শিক্ষার আলো পৌঁছোলো না তাদের কাছে। ক্রমশ সংস্কৃত ও ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু উচ্চবিত্ত অভিজাতের হাতে চলে গেল অর্থনীতি - সমাজনীতি - রাজনীতি এমনকি সাহিত্যেরও নিয়ন্ত্রণ। আজকে যে পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজকে আমরা দেখি তারা কিন্তু চিরকাল পশ্চাৎপদ ছিল না। সাহিত্য - শিল্প - সংস্কৃতি সবেতেই তাদের যথেষ্টই অবদান ছিল। গ্রাম-শহরের পার্থক্যের মধ্যে দিয়েই মুসলমান আর হিন্দুর মধ্যে ভাষাগত-সংস্কৃতিগত ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে লাগলো। ব্যবধান একসময় পরিণত হোল দ্বন্দ্ব, বিবাদ-বিসম্বাদ সংঘর্ষে। ঔপনিবেশিক ইংরেজ যে প্রথম থেকেই এই সাম্প্রদায়িক বিভেদের সুযোগ নিচ্ছে তা সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোনো মনীষীর পক্ষে বোঝা সম্ভবই হয় নি। ফলাফল দাঁড়ালো দেশভাগ। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে হয়তো দ্বিতীয় বারও এই বঙ্গবিভাগকে রুখে দিতে পারতেন। বঙ্গভাষা-বাঙালি ও - বাংলার অস্মিতায় হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে ফাটল ধরতো না।

গ্রন্থঋণ....

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ড. সুকুমার সেন
ইসলামী বাংলা সাহিত্য : ড. সুকুমার সেন